হয়তো : বিকল্প সম্পর্কের সাংকেতিক সেতু

স্নিগ্ধা বন্দ্যোপাধ্যায়

'হয়তো' শব্দটিকে সামনে রেখেই গল্পের অভ্যন্তরে গল্পের বিকাশ এবং পরিণতির ইঙ্গিত। প্রেমেন্দ্র মিত্রের (১৯০৪-১৯৮৮) 'হয়তো' গল্পে ('পুতুল ও প্রতিমা' গল্পগ্রন্থ, ১৯৩২)[১] বর্ণিত সেতুটির দুই পারের অন্ধকারের মতো কাহিনির শুরু এবং শেষ রহস্যময় অন্ধকারে ঢাকা; মাঝখানে বিশ্বাস ও সন্দেহে দোদুল্যমান বিপজ্জনক জীবনসেতু—যেখানে আটকে ঝুলছে দাম্পত্যসম্পর্ক। আকস্মিক আঘাতে পড়ে গিয়েও সেতুতে উঠে আসে লাবণ্য চরিত্র নয়, যেন পাঠকই। কিন্তু অভ্যস্ত সংস্কার বিপর্যস্ত হয়ে যায়, শুধু থাকে স্বস্তিহীন অনুভূতি 'হয়তো'। আদি অন্তহীন কাহিনীর বুননে আস্থা-অনাস্থার টানাপোড়েনে গাঁথা মানব-মনের অনুভূতি—যার রহস্য 'হয়তো' আদি অন্তহীন—মনোলোকের সেই অতল অন্ধকারে জেগে আছে একটি বিন্দুশীর্ষ 'হয়তো' ...

'কেন লিখি' প্রবন্ধে প্রেমেন্দ্র মিত্র লিখেছেন,

> ...."লেখাটা শুধু অবসর বিনোদন নয়, মানসিক বিলাস নয়।
> সামনে ও পেছনের এই দুর্ভেদ্য অন্ধকারে দুর্জ্ঞেয় পণ্যময় জীবনের কথা
> জীবনের ভাষায় বলার বিরাট বিপুল এক দায়।"[২]

অন্ধকার দুর্যোগের রাতে সেতু পারাপারের চেষ্টা করেছে মহিম ও লাবণ্য; তাদের দাম্পত্যসম্পর্কের একদিকে সংশয়বিদ্ধ বিশ্বাস এবং অন্যদিকে বিশ্বাসব্যাকুল সন্দেহ, মাঝখানে—

> ..."একটা নূতন অর্ধসমাপ্ত সেতু....। ....চলাচলের উপযুক্ত হইয়া ওঠে নাই।"

এখান থেকেই ছোটোগল্পের কুশলী শিল্পী প্রেমেন্দ্র মিত্র 'জীবনের কথা জীবনের ভাষায় বলার বিরাট বিপুল এক দায়' স্বীকার করে নিয়েছেন।

কবি এবং কথাসাহিত্যিক হিসেবে প্রেমেন্দ্র দর্শকের দৃষ্টি দিয়ে জীবনের সমগ্রতাকে দেখতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রোত্তর কালে কল্লোলের লেখককুল যে আধুনিকতার সূচনা করেছিলেন তার মূলে ছিল বাস্তব জীবন। রবিশস্যের খামার পেরিয়ে আধুনিক জীবনের জটিল মননের ভূমিতে উত্তরণের পথে সেদিন দুঃসাহসী লেখককুলের স্বাধিকারপ্রমত্ত প্রচেষ্টা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রেমেন্দ্র তাঁদেরই একজন। 'প্রথমা'-র কবি প্রেমেন্দ্রর অন্বিষ্ট 'গোটা মানুষের মানে!' এই বস্তুনিষ্ঠ সমগ্রদৃষ্টি গল্পকার প্রেমেন্দ্রকে দিয়েছে অনন্যতা। তাঁর সহানুভূতি জীবনের প্রতি, কোন বিশেষ মানুষের প্রতি নয়।

গল্পের মূল চরিত্র সংশয়। টানটান অনিশ্চয়তায় বিশ্বাসের সেতু থেকে পড়ে গিয়েও পাঠক লেখকের হাত ধরে উঠে আসে জীবনের সেতুতে; কিন্তু সে জীবনে সংলগ্ন হয়ে যায় সংশয়—'হয়তো'; এখানেই গল্পকারের 'বস্তুনিষ্ঠ সমগ্রদৃষ্টি' এবং স্থিতাবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। জীবনের মধ্যে যে আকস্মিকতার স্পর্শ আছে তাকে ছুঁয়েছেন তিনি। ঝড়বৃষ্টির অন্ধকার রাতে স্পষ্ট আলোকে স্পষ্ট দেখা গেছে দাম্পত্যসম্পর্কের ফাটল। লাবণ্য এবার রক্ষা পেলেও লেখকের নির্লিপ্ত মন্তব্য—

"হয়তো আর কোথাও জীবনের সেতু হইতে মহিম লাবণ্যকে কবে ঠেলিয়া দিয়াছে!"

আকস্মিক মুহূর্তটি জন্ম দিয়েছে অনির্দেশ্য ঘটনার সম্ভাব্য ইঙ্গিত 'হয়তো'... গল্পটি বিষয় এবং আঙ্গিকে প্রেমেন্দ্র মিত্রের জীবন জিজ্ঞাসার সঙ্গে সার্থক সংলগ্ন।

আলোচ্য গল্পের বিষয় দাম্পত্যসম্পর্কের জটিল বাস্তব রূপ। শুধু 'হয়তো' নয়, প্রেমেন্দ্র-র বেশ কিছু গল্পের প্রতিপাদ্য বিষয় দাম্পত্যসম্পর্কের জটিলতা ('ভস্মশেষ', 'শৃঙ্খল', 'স্টোভ' ইত্যাদি)। তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য গল্প 'শুধু কেরাণী' দম্পতির গল্প। দাম্পত্য সম্পর্কের বিভিন্ন কৌণিক অবস্থান থেকে তিনি দেখেছেন এবং দেখিয়েছেন। প্রতিটি গল্পেই দাম্পত্য বিষয়ের ভিন্নতর ব্যঞ্জনা।

'হয়তো' গল্পের দম্পতি মহিম এবং লাবণ্য। এই নাম দুটি লেখকের কল্পনার চিহ্নমাত্র, আদিম রহস্যময় অন্ধকারে তারা নির্বিশেষ—

....."তরল অন্ধকারে দুইটি নাতিস্পষ্ট নরনারী-মূর্তি"....

অবস্থানগত বাস্তবতার হেরফেরে এ গল্প দম্পতির নয়, জটিল দাম্পত্যসম্পর্কের গল্প, যা প্রেমেন্দ্র-র অন্যান্য গল্পগুলির থেকে স্বতন্ত্র। গল্পের তথা দাম্পত্যসম্পর্কের অভ্যন্তরে প্রবেশের কুঞ্চিকা এক অদ্ভুত অনুভূতি—'হয়তো'—দাম্পত্যসম্পর্কের রহস্যময় অন্ধকার তলদেশ ঘেঁটে তুলে আনা অনাদি-অনন্ত ইশারা।

উপস্থাপনার নিরিখে 'হয়তো' গল্পের কাহিনি অনন্য। গল্পকারের কৈফিয়তের সূত্রে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, শিল্পী একটি দৃশ্যকে ভিত্তি করে একটি নিটোল ছোটোগল্প পরিবেশন করতে চেয়েছেন। কাহিনি তাঁর সাজানো বলে শুরু করেছেন এবং শেষ করেছেন 'হয়তো'—সম্ভাব্য ইঙ্গিতে; এখান থেকে শুরু হয়েছে পাঠকের মনে মনে আর এক কাহিনির নির্মাণ। 'হয়তো' শব্দটির আক্ষরিক অর্থের নির্মোক খুলে গেলে উদ্ভাসিত হয় গল্পের অন্তর্গত গল্পটি (story within a story)।

গল্পটি শুরু হয়েছে লেখকের দেখা একটি ঘটনার কথা দিয়ে। কোন এক অন্ধকার ঝড়ের রাতে দুই নরনারী অর্ধসমাপ্ত বিপজ্জনক সেতু পার হবার চেষ্টা করছে। ভীত অনিচ্ছুক মেয়েটিকে যেন পুরুষটি আকর্ষণ করছে। পার হতে গিয়ে পড়ে যায় মেয়েটি। তার চিৎকার শুনে লেখক দেখেন সেতুতে শাড়ি আটকে মেয়েটি নিম্নমুখী হয়ে নদীর ওপর অতল অন্ধকারে ঝুলছে। সঙ্গী পুরুষটির সাহায্যে লেখক তাকে টেনে তুলে আনেন সেতুটির ওপর। ধন্যবাদ না জানিয়ে চলে যাবার সময় তাদের পারস্পরিক সংলাপ লেখকের মনে 'চিরন্তন সন্দেহ ও বিস্ময়' জাগিয়ে তুলেছে। মেয়েটি বলে,

..."কী আশ্চর্য দেখো, প'ড়ে যাবার সময় আমার যেন মনে হল তুমি আমায় ঠেলে দিলে। পা ফসকে তো পড়িনি, আমার যেন ঠিক মনে হল তুমি ঠেলে দিলে..."

পুরুষটি তাকে হেসে বলে,

"পাগল! কি যে বলো; আমি ঠেলে দেব তোমায়..."

লেখকের দেখা এবং শোনা এখানেই শেষ। এখান থেকেই দ্বিতীয় কাহিনির শুরু। লেখক জানিয়েছেন তিনি ঐ ঘটনা ভুলতে পারেন নি—

"সময়ে অসময়ে সেই বিপদসঙ্কুল সেতুর উপর অস্পষ্টভাবে দেখা মূর্তি দুইটি সম্বন্ধে নানা সন্দেহ, নানা প্রশ্ন মনে জাগে।"

মানুষের জান্তব অস্তিত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাই গল্পকারকে প্ররোচিত করেছে একটি কাহিনি রচনায়—

"সেই অসাধারণ ঘটনা ও সেই অস্পষ্ট দেখা দুইটি মূর্তিকে কেন্দ্র করিয়া একটি কাহিনী মনের ভিতর আপনা হইতেই গড়িয়া ওঠে।"

দ্বিতীয় গল্পটি কল্পনা মাত্র জানিয়ে লেখক কাহিনির অভ্যন্তরে নিয়ে যান পাঠককে। নিয়োগীদের সাতপুরুষের কোটা' এক জরাজীর্ণ অট্টালিকায় প্রবেশ করছে নবদম্পতি মহিম এবং লাবণ্য। একদা অত্যাচারী-অনাচারী সামন্ততান্ত্রিক পরিবারের শেষ বংশধর মহিম। সে স্ত্রী লাবণ্যের সঙ্গে অসুস্থ দাম্পত্যজীবন যাপন করে। তার ব্যবহারে ধারাবাহিকতা নেই। অত্যন্ত সাধারণ প্রশ্নোত্তরের মাঝে সে উত্তেজিত হয়ে পড়ে—

"একবার জড়িয়ে ধ'রে কাছে টেনে নিলেই পছন্দ হয়ে গেল!
এই তো পছন্দের দাম? কেমন, না?"

আবার উত্তেজনা কমে গেলে বলে,

"ও কিছু নয়, তোমার সঙ্গে একটু ঠাট্টা করলাম! তুমি আমায় সারাজীবন সত্যি ভালোবাসবে তো? —বাসবে?"

কখনো রাতে সে লাবণ্যর আঁচলে আর নিজের কাপড়ে গেরো বেঁধে রাখে। কখনো বা তাকে ঘরে বন্ধ করে দেয়। মাধুরী এসে তাকে মুক্ত করে। কিন্তু সেও অস্বাভাবিক এবং রহস্যময় চরিত্র। লাবণ্যর ফুলশয্যার রাতে তার ফুলের গহনা নিজে পরে এবং তারপর নষ্ট করে ফেরত দিয়ে যায়। আবার কখনো মাধুরী লাবণ্যকে নিয়ে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করতে চায়। একচক্ষু পিসিমা মূর্তিমতী জরা, শকুনির মতো দৃষ্টি নিয়ে হিংস্র শ্বাপদের মতো সম্পত্তি আগলে রয়েছে।

মহিম সম্পত্তির পিছুটান উপেক্ষা করে পথে বেরিয়ে পড়ে। লাবণ্যর ভালোবাসার শুচিস্নান করে সে সুস্থ জীবনযাপন করতে চায়। কিন্তু অকারণ সন্দেহ তার রক্তের গভীরে অসুখের জন্ম দিয়েছে। সেতু পারাপারের সময় টানাটানিতে অথবা তার ধাক্কায় লাবণ্য পড়ে গিয়েও উঠে আসে সেতুতে। কিন্তু দাম্পত্যসম্পর্কটিকে আমূল বিদ্ধ করে দেয় সন্দেহের কাঁটা—'হয়তো'....। এখানেই দ্বিতীয় গল্পটি শেষ।

পোল পার হয়ে দম্পতি কোথায় গেল লেখকের কল্পনার অগম্য। নিজের কল্পনায় ছেদ টানলেও লেখক তৃতীয় গল্পটির সম্ভাবনা জাগিয়ে তুলেছেন পাঠকের কল্পনাকে উসকে দিয়ে—

"কে জানে, মাধুরী হয়তো সেই জনহীন ধ্বংসাবশিষ্ট প্রাসাদের কক্ষে-কক্ষে এখনো প্রেতিনীর মতো ঘুরিয়া বেড়ায়। হয়তো আর কোথাও জীবনের সেতু হইতে মহিম লাবণ্যকে কবে ঠেলিয়া দিয়াছে।"

কে এই মাধুরী? চৌধুরী বংশের সঙ্গে তার কি সম্পর্ক? 'প্রেতিনীর মতো' উপমায় লেখক কি ইঙ্গিত করেছেন? লাবণ্য এবারের মতো বাঁচলেও মহিম কি তাকে আবার অন্য কোথাও ফেলে দেবে? এরকম অনেকগুলি 'হয়তো' ...কে ঘিরে পাঠকের মনে লতিয়ে ওঠে তৃতীয় গল্পটি—যার আভাসমাত্র দিয়ে লেখক অর্ধসমাপ্ত কাহিনির সেতু পথটি পার হয়ে যাবার দায় পাঠকের হাতে তুলে দিয়েছেন।

পরিকল্পিত বিভ্রান্তি (calculated indirection)-এ গল্পের শৈলীর বৈশিষ্ট্য। গল্পকার পাঠককে reality থেকে illusion-এর জগতে নিয়ে যাবার জন্যে সচেতনভাবে আপাত বিভ্রান্তি তৈরি করেছেন।

প্রথম গল্প উপস্থাপিত হয়েছে উত্তম পুরুষ বা আত্মকথন রীতিতে, দ্বিতীয়টি সর্বজ্ঞ রীতি এবং তৃতীয় গল্পের সম্ভাবনা জেগে উঠেছে আত্মকথন রীতিতে।

ছোটোগল্পের প্রকরণ প্রসঙ্গে প্রেমেন্দ্র মিত্রের মন্তব্য এখানে প্রাসঙ্গিক এবং উদ্ধারযোগ্য :

> "...সব গল্পেরই আরম্ভ মাঝখান থেকে, ...। গল্প চলে বহুবর্ণ স্রোতের মত বয়ে, তার মাঝের খানিকটা ধরি মাত্র, ...এই ঘাট থেকে আর এক ঘাটে। ব্যস্ এই পর্যন্ত কিংবা বলতে পারো অপরূপ কোন বয়ন বস্ত্র থেকে বেরিয়ে আসছে নানা রঙের কাজ অফুরন্ত বনাত, আমরা মাঝখান থেকে হঠাৎ কাঁচি চালাই, কেটে আনি এক টুকরো রঙ বেরঙ-এর কাপড়।"[৩]

জীবন নামক বাস্তবের শুরু এবং শেষ রহস্যময় অন্ধকারে ঢাকা। 'হয়তো' গল্পেরও শুরু এবং শেষ নেই। এই আঙ্গিক স্মরণ করিয়ে দেয় গল্পকারের উক্তি—

> "...শুরুও সত্যি বলতে গেলে কোন গল্পেরই নেই, শেষও না।"[৪]

'হয়তো' গল্পটি পরিবেশিত হয়েছে রহস্যময় শিহরণ জাগানো আবহে। একটি দৃশ্য দেখে এবং শুনে লেখক কাহিনি কল্পনা করেছেন। তিনি ছেলেবেলায় প্রথম কল্পনার ব্যবহার শিখেছিলেন খেলার সাথী লজ্জুর কাছে এবং গল্পলেখার হাতে খড়ি কিশোর বয়সে বীরুমামার কাছে।[৫] সেইসূত্রে 'স্বপ্নালোকিত জরাজীর্ণ অট্টালিকার প্রকোষ্ঠ', 'রহস্যময় পরিবেশ' তাঁর শিশুমনকে প্রভাবিত করেছিল। 'হয়তো' গল্পের পরিবেশে তার ছায়া ('তেলেনাপোতা আবিষ্কারে'ও)। ঝড়বৃষ্টির রাতের অন্ধকার, অস্পষ্ট আলোকে ছায়াচ্ছন্ন নরনারী, বিশাল ভগ্ন প্রাসাদ, মাকড়সা, চামচিকে, ইঁদুর, সরীসৃপ ইত্যাদির আশ্রয়; মহিমের অসুস্থতা, পিসিমার বীভৎস দৃষ্টি, মাধুরীর অস্বাভাবিকতা—সব মিলিয়ে লাবণ্য কেন পাঠকেরও গা ছম্ ছম্ করে। এই শিহরণ জাগানো আবহে পরিবেশিত হয়েছে নরনারীর বিষিয়ে যাওয়া সম্পর্কের গল্প।

শ্রেণিবিচারে দাম্পত্যসম্পর্কের এই গল্পটি মনস্তাত্ত্বিক বলা যেতে পারে। লেখকের সাজানো কাহিনিতে গল্পের বাস্তবতা আসলে পাত্রপাত্রীর মনোলোকের রহস্যময়তায় নিহিত। জীর্ণ অট্টালিকা, মহিমের ব্যবহারে বৈপরীত্য, মাধুরীর অস্বাভাবিকতা এবং ইঙ্গিতময় সংলাপ, পিসিমার হিংস্র দৃষ্টি, সঞ্চিত গহনার স্তূপ—এসবই প্রতীকী মাত্রায় উদ্ভাসিত হয় পাঠকের মনে। মহিমের মনে বাসা বেঁধেছে বদ্ধমূল ভ্রান্তিজনিত অসুস্থতা; মনোবিজ্ঞানের পরিভাষায় যার নাম 'Paranoia', আর কবির ভাষায় তার রক্তের গভীরে খেলা করে বিপন্নতা—নিজে

পুড়ে অন্যকে পুড়িয়ে যার পরিণতি অতল খাদের অনির্দেশ্য অন্ধকারের দিকে। এই বিধ্বংসী প্রবৃত্তির পাশাপাশি স্ত্রীর ভালোবাসার জন্য আকুল আকাঙ্ক্ষা। —দুয়ের টানাপোড়েনে মহিম অস্থির। জীবনের সেতু থেকে পড়ে যাওয়া এই মানুষটি লাবণ্যকে আশ্রয় করে উঠে আসতে চেষ্টা করে—

> "তুমি জানো না লাবণ্য, কত বাধা, রক্তের ভেতর কত বিষ জমে আছে। কিন্তু এ-বিষ থেকে আমি মুক্ত হবই, শুধু যদি তোমার ভালোবাসা পাই।"
>
> *
>
> "...অসুস্থ মনে অকারণ সন্দেহ জাগে। সে-সন্দেহে মিছে পুড়ে মরি, তোমাকেও পোড়াই।'

কিন্তু নতুন জীবন শুরু করার আশা দিয়েও সে স্ত্রীকে সেতু থেকে ফেলে মারতে চায়। তাকে তাড়া করে সন্দেহ—

> "কী বিশ্বাস নারীকে করা যায়? কী তাহার প্রেমের মূল্য? আজ যে ভালোবাসিয়াছে কাল বিশ্বাসঘাতকতা করিতে তাহার কতক্ষণ!"

লাবণ্য বেঁচে ফিরে এলেও সন্দেহের কাঁটা বিঁধে যায়—'হয়তো'। লেখক নরনারীর সম্পর্কের গভীরে ডুব দিয়ে তলদেশ ঘেঁটে তুলে এনেছেন জটিল মনস্তাত্ত্বিক অনুভূতি—প্রবহমান জীবনের রহস্যময় ইশারা—সম্ভাব্যতার শিহরণ অজস্র 'হয়তো'...

গল্পটির গদ্যভাষা পরিবেশ সৃজনে, চরিত্র নির্মাণে যথাযথ এবং আবেদনে সূচীমুখ। ভাষার দুটি রূপ—বর্ণনা ও সংলাপ। বর্ণনার ভাষা সাধু এবং সংলাপের চলিত। সাধু ও চলিত রীতির গ্রন্থনে বর্ণনা ও সংলাপের যুগলবন্দি আদ্যন্ত পাঠকের কৌতূহল জাগিয়ে রাখে।

শব্দ ব্যবহারে বৈপরীত্য গল্পের প্রবাহে মানানসই। সাধু গদ্যে কথ্য ভাষা বর্জনের শুচিতা নেই। একই বাক্যে 'অনুসরণ' এবং 'গজ গজ', 'গন্ধভারাক্রান্ত পথ' এবং 'হোঁচট' শব্দযুগ্মের সহবস্থান বিসদৃশ হয় নি। একাধিক ধ্বন্যাত্মক শব্দ ব্যবহারে সঞ্চারিত হয়েছে অভ্যস্ত ঘরোয়া সুর :

> ক. "পিছনে ঝি বাধ্য হইয়া তাহাদের অনুসরণ করিতে করিতে আপনমনেই গজগজ করিতেছিল"—...
>
> খ. "ট্যাং ট্যাং ক'রে এক মড়িপোড়া পুরুত এল বরকে নিয়ে;"

চরিত্রানুগ সংলাপ রচনায় শব্দচয়ন লেখকের বাস্তবতাবোধের পরিচায়ক। কনের সঙ্গী কাজের মহিলার সংলাপে 'গা', 'গো', 'ওমা', 'মিনসে', 'বরযাত্তর', 'মড়িপোড়া', 'আকখুটে', 'জাতগোত্তর', 'শ্যাল-কুকুর', 'নেমকানুন', 'মুখপোড়া' প্রভৃতি কথ্য বাংলা শব্দ চরিত্রের সামাজিক অবস্থান এবং মানসিক বিরক্তির সার্থক প্রকাশ।

মহিম প্রসঙ্গে মাধুরীর সংলাপে 'কুরে কুরে খায়' শব্দগুচ্ছে ঘুণপোকার চিত্রকল্পে মানসিক যন্ত্রণা ও ক্ষয় ফুটে উঠেছে। বর্ণনার ভাষায় প্রেমেন্দ্র একাধিক অলংকার ব্যবহার করলেও কবিত্বের সৌরভ ভাবালুতা সৃষ্টি করে নি। দু-একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে :

> ক. "পথের ধারের গাছগুলি ঝড়ের তাড়নায় অসহায় বন্দির মতো মাটির

শৃঙ্খল ছিঁড়িবার জন্য যেন উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে।''

খ. ''শকুনির মতো শীর্ণ বীভৎস মুখের কানা একটি চোখের ভয়ঙ্কর দৃষ্টি দিয়া মূর্তিমতী জরা যেন তাহাকে বিদ্ধ করিতেছে।''

'হয়তো' নামকরণ সাংকেতিক। গল্প তথা দাম্পত্যসম্পর্কের সামনে ঝুলিয়ে দিয়েছে সম্ভাব্যতার শিহরণ; অথবা বলা যায় 'হয়তো' এই সম্ভাব্যতাকে সামনে রেখেই গল্পের বিস্তার।

লেখকের কৈফিয়ৎ অনুযায়ী গল্পের ভেতরের গল্পটি কাল্পনিক অর্থাৎ 'হয়তো'-কে আশ্রয় করেই গড়ে উঠেছে এবং গল্পের শেষে দুটি বাক্যে 'হয়তো' শব্দের ব্যবহারে তৃতীয় গল্পের সম্ভাব্য ইঙ্গিত দিয়ে লেখক পাঠকের কল্পনাকে উসকে দিয়েছেন।

তৃতীয়ত, মহিম চরিত্রটির মন আগাগোড়া নানান 'হয়তো'র টানাপোড়েনে অস্থির। তার চরিত্রটি চিহ্নিত হয়েছে 'হয়তো' কে সামনে রেখেই। মাধুরীর অস্বাভাবিকতা আবর্তিত হয় 'হয়তো'-কে ঘিরে। লাবণ্য মরতে মরতেও ফিরে আসে 'হয়তো'-র কাঁটায় বিদ্ধ হয়ে। পিসিমা চরিত্রটিও 'হয়তো'-র ঘেরাটোপে ঘেরা।

'হয়তো'-কে ঘিরে উপস্থাপনায় গল্পের বিষয় এবং আঙ্গিকে এসেছে স্বাতন্ত্র্য। কাহিনীর শুরু এবং শেষ অন্ধকারে—যে আবহে 'হয়তো'-র বিস্তার। আগাগোড়া 'হয়তো'-কে ঘিরে বিকশিত গল্পের দাম্পত্যসম্পর্কটির কেন্দ্রবিন্দুতেও 'হয়তো'। এমন বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনায় প্রাসঙ্গিক ও সার্থক নামকরণ 'হয়তো'।

নিটোল ছোটোগল্পের উদ্দেশ্য নির্ণয়ের সরল প্রয়াস করেন নি প্রেমেন্দ্র; তিনি মনস্তাত্ত্বিকের মতো মনের সমুদ্রে ভাসমান হিমশৈলের উপরিতলের চিত্র তুলেছেন, বাকি সবটুকুই অতলে ইশারা করেছেন। কাহিনিরচনার কৈফিয়ৎ দুর্বলতা[৬] নয়, বরং শৈলীর স্বাতন্ত্র্য। কাহিনির আদি ও অন্ত রহস্যের অন্ধকারে অদৃশ্য, কেবল নড়বড়ে সেতুটিই অস্পষ্ট আলোকে দৃশ্যমান—'হয়তো' শব্দ সংকেত যেন সেই অতল অন্ধকারে জেগে থাকা বিন্দুশীর্ষ।

গল্পের বাস্তবতা বহির্জগতের নয়, মনোজগতের। আসলে জীবনের সেতু থেকে লাবণ্য নয়, পাঠকই যেন পড়ে যায়, লেখকই যেন ধাক্কা মেরে ফেলে দেন। দাম্পত্যসম্পর্কের আদিপ্রতিমা (archetype)[৭] ভেঙে যায়। তলিয়ে যেতে যেতেও লেখকের হাত ধরে উঠে আসে পাঠক। কিন্তু বিপর্যস্ত হয়ে যায় অভ্যস্ত মূল্যবোধ; 'হয়তো'র সংকেতে বিকল্প সম্ভাবনার কাঁটায় বিদ্ধ হয়ে পাঠক মনে মনে পারাপার করে সেতুর নামান্তরে জীবনের বাকি পথ আর সে পথের সঙ্গী হয় অজস্র 'হয়তো'...

তথ্যনির্দেশ

১. আলোচ্য গল্পটি পরবর্তীকালে 'প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ গল্প' (১৯৫২) সংকলনেও স্থান পেয়েছে।
২. 'কেন লিখি', প্রেমেন্দ্র মিত্র, 'জলদর্চি', ১১ বর্ষ, ১-৪ সংখ্যা, ২০০৩, পৃ. ৯, ১০।
৩. প্রেমেন্দ্র-র উক্তি 'প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্প প্রসঙ্গে' প্রবন্ধ, জানুয়ারি, ১৯৮৯ (সুব্রত নিয়োগী, 'প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ গল্প', 'দে'জ পাবলিশিং, ১ম দে'জ সং, ২০০১, পৃ. ২৩৭) থেকে নেওয়া হয়েছে।
৪. তদেব।

৫. 'প্রেমেন্দ্র মিত্র', সুমিতা চক্রবর্তী, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, অগাস্ট ১৯৯৮, পৃ. ১০, ১২, ১৩।
৬. " 'হয়তো' গল্পকারের সুপরিবেশনার অনন্য নজির। তৎসত্ত্বেও গল্পকার যে প্রেক্ষণবিন্দু অবলম্বন করেছেন তার নিরিখে বিচার করলে এবং একটি নিটোল ছোটগল্প উপস্থাপিত করতে চাইছেন— সেই উদ্দেশ্যের দিকে দৃষ্টি দিলে গল্পকারের এহেন কৈফিয়ৎ সন্নিবেশ গল্পের দুর্বলতম অংশ বলেই মনে হয় :" ...প্রসূন ঘোষ, 'প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্প : অবক্ষয়মান মানবসত্তা', 'ছোটগল্পের বিকাশ পরিণতি ও উপলব্ধি', মাপা : উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, জ্যোতিপ্রসাদ রায়, বামা পুস্তকালয়, ১ম প্রকাশ, ২০০৪, পৃ. ১৭৬-১৮৯।
৭. 'হয়তো গল্পে দাম্পত্য প্রেমের রোমান্টিক স্বপ্নময় রূপ ভেঙে গেছে।

এছাড়া অন্যান্য সহায়ক সূত্র

১. 'ছোটোগল্পের রূপশিল্পী : প্রেমেন্দ্র মিত্র', ড. রামরঞ্জন রায়, পরিবেশক দে বুক স্টোর, আগস্ট ১৯৮৫।
২. 'প্রসঙ্গ : প্রেমেন্দ্র মিত্র', ড. রামরঞ্জন রায়, মান্না পাবলিকেশন, ১৪০৪।
৩. 'বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার', ভূদেব চৌধুরী, মর্ডানবুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ৫ম প্রকাশ, ২০০৩।
৪. 'বাংলা ছোটগল্প : প্রসঙ্গ ও প্রকরণ', বীরেন্দ্র দত্ত, পুস্তক বিপণি, ৫ম সং, ২০০৪।
৫. 'প্রেমেন্দ্র মিত্র ও আধুনিক বাংলা সাহিত্য' সম্পা : তরুণ মুখোপাধ্যায়, শীতল চৌধুরী, সাহিত্যলোক, ১ম প্রকাশ, ২০০৪।
৬. 'গল্প পাঠকের ডায়ারি', উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০০৫।
৭. 'গল্প নিয়ে উপন্যাস নিয়ে', হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ১৪১২ ('প্রেমেন্দ্র মিত্রের তিনটি গল্প : বিপন্নতার তিন টুকরো')।
৮. 'প্রেমেন্দ্র মিত্র : বেনামী বন্দর থেকে সাগরসঙ্গমে' সম্পা : পার্থ শর্মা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ১৪১২।
৯. 'প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্প : মননে ও সৃজনে', অনিন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, পুস্তক বিপণি, ২০০৫।

পত্র-পত্রিকা

১. 'অর্ঘ্য' : প্রেমেন্দ্র মিত্র : শতবর্ষে স্মরণ, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জানুয়ারি, ২০০৪।
২. 'শিল্প ও সাহিত্য' প্রেমেন্দ্র মিত্র সংখ্যা, জুন-জুলাই, ১৯৮৩।
৩. 'ইতিবাচক', বর্ষ ১, সংখ্যা ১, জুলাই '৮৮-('প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্প', রবীন্দ্র গুপ্ত; 'আমার গল্প', প্রেমেন্দ্র মিত্র)।
৪. 'আভা' প্রেমেন্দ্র মিত্র সংখ্যা, বর্ষ ৯, সংখ্যা ১১-১২, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ১৯৮১।
৫. 'জলদর্চি', বর্ষ ১১, সংখ্যা ১-৪, ২০০৩ ('ছোটোগল্পকার প্রেমেন্দ্র মিত্র', অমর সাহা)।
৬. 'সাংস্কৃতিক খবর', বর্ষ ২৪, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৩ ('ছোটোগল্পে প্রেমেন্দ্র মিত্র', তপন বন্দ্যোপাধ্যায়)।